বঙ্কিমচন্দ্র ও রেজাউল করিম

জাহিল হাসান

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বন্ধু নন, এই আপশোষ মুসলমানদের বহুদিনের। যাঁদের সাহিত্যপাঠের চি বা সুযোগ নেই, তাঁদের এ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথাও নেই, বড়ো জোর জনশ্রুতি কানে গেলে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি করেনেন - মনে আনন্দনঠের লেখক সম্পর্কে। যাঁরা আগ্রহী পাঠক বা নিজে লেখক, তাঁদের অবশ্য উপায় নেই বঙ্কিমচন্দ্রকে এড়িয়ে থাকার। কিন্তু তাঁরাও অধিকাংশই এই ক্ষোভের শিকার, অল্পজনই আছেন যাঁরা মনে করেন বড়ো লেখকের ত্রুটি -বিচ্যুতিও বিচার করতে হয় সম্ভ্রমের সঙ্গে। কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আবেগের বিদ্ধেগিয়ে সাহিত্য সম্রাটের হয়ে কথা বলার মানসিকতা রেজাউল করীমের মতো আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, এর ছ বছর আগে বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে লিখতে শু করেন তিনি। কংগ্রেসি হিসেবে লিগ নেতা ও লিগ অনুগামী লেখকদের বঙ্কিম - বিরোধিতার প্রতিবাদ করা কর্তব্য মনে করেই যে তিনি বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এমন নয়। যেটুকু লিখেছেন নিজের বিশ্বাস থেকেই এবং দেশভাগের অনেক পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও যে তাঁর সেই বিশ্বাস অটুট ছিল, তা মুত্যুর অল্প কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকায় আবুল বাশারকে দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে পরিষ্কার।

বঙ্কিমের বিদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগ প্রধানত আনন্দমঠের জন্যই। তার সঙ্গে জুড়ে গেছে দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসও। রেজাউল বলতে চেয়েছেন যে আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে, তখন বা তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। বিশ শতকের তিনের দশকে যখন হিন্দু - মুসলমানের বিরোধ তীব্র আকার নেয়, তখনই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে খুঁড়ে আনা হয় বঙ্কিমের লেখা থেকে মুসলিম - বিদ্বেষের ভূত। আনন্দমঠ যখন বেরিয়েছিল, তখন অবশ্য ইংরেজের হাতে পরাজয়ের ধাক্কায় জাতীয় জীবনের সর্বস্তর থেকে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় নিজেদের গুটিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিবাদ বা সমর্থন জানানোর মতো মানুষও খুব বেশি ছিল না তখন। বঙ্কিমের সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লেখক বলতে ছিলেন একমাত্র মীর মশার্‌রফ হোসেন, যিনি যুগের প্রভাবেই বঙ্কিমের ভাষাশৈলী অনুসরণ করে লিখতে শু করেন। শুধু তা-ই নয়, হিন্দু - মুসলমান সম্পর্কের উন্নতির জন্য গোবধ বন্ধের সুপারিশও করেছিলেন তিনি। পরে এই মানুষইশুধু যে ভাষাভঙ্গি বদলালেন তা-ই নয়, প্রতিবেশী সম্প্রদায় সম্পর্কে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্যে কোনো কোনো জায়গায়। কেন তাঁর এই পরিবর্তন, তা এখানে আলোচনা করতে গেলে লেখা অন্যদিকে চলে যাবে। এইটুকু বলা যেতে পারে যে, যে - প্রতিষ্ঠা ও সম্মান তিনি আশা করেছিলেন, দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যসেবা করেও তা তিনি পাননি। এ সত্ত্বেও তাঁর মনে কোনো সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছিল না। পরে যে - দুজন মুসলামান লেখক কিছুটা সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কায়কোবাদ, দ্বিতীয়জন মোজাম্মেল হক। এই দুজনও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের এবং হিন্দু - প্রধান বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন ধারা মেনেই লিখে গেছেন। কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যের (লক্ষনীয়, কবরস্থান বা গোরস্থান নয়, শ্মশান) কাহিনি যদিও মুসলিম ইতিহাস থেকে নেওয়া, পরবর্তী কালে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে এই লেখা নিন্দিত হয়েছে অনৈসলামিক ও অশ্লীল বলে। তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল নানা কারণে। একদিকে ছিল হিন্দু - সৃষ্ট সা

হিত্যে ক্রমাগত মুসলমানদের প্রতি অবমাননাকর উল্লেখ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার, অন্যদিকেপ্রধানত উর্দু- ঘেঁষা অ াশরাফ মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র্যবাদী মনোভাব ও ওহাবি - ফরায়েজি আন্দোলনের জেরে ধর্মের গোঁড়ামি বৃদ্ধি। মুসলম ানদের পক্ষে তীব্র আপত্তিকর যবন, নেড়ে ইত্যাদি শব্দ বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্য ায়, হেমচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ওআরও অনেকের লেখার মধ্যে দেখতে প াওয়া যায়।

সিপাহি যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কার্যকরী ক্ষমতা কোম্পানির হাতে থাকলেও কাগজে - কলমে মোগল রাজত্ব বজায় ছিল। এর ঠিক একশো বছর আগে পলাশির কপট যুদ্ধে সিরাজ উদ্‌দৌলাকে হারিয়ে ইংরেজ পূর্ব ভারতে আধিপত্য লাভ করে। এই ধরনের যুগান্তকারী উত্থান - পতনে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বড়ো ভূমিকা থাকে। স ম্প্রতি সমাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রের লড়াইয়েও তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আঠারো শতকে মোগল - পাঠান - তুর্কি রাজ াদের সামরিক শক্তি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তাঁরা অনেকেই ইয়োরোপীয় ভাড়াটে সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করতেন নিজেদের বল বাড়াবার জন্য। উন্নত সমরবিদ্যার জোরে পরে ইয়োরোপীয়রাই দেশ দখল করে নেয়। নতুন কালের এগিয়ে - থাকা প্রযুক্তির কাছে অতীতের পিছিয়ে - পড়া প্রযুক্তির পরাজয় ছিল অবধারিত। মুসলমান শাসন কথাটা ইংরেজদের চালু করা মুসলমান রাজা - বাদশাদের শাসনের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। প্রথমত মুসলমান রাজপুষদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট খেয়োখেয়ি ছিল, আর শাসক - শাসিতের বৈষম্যে কোনো পরিবর্তন হয় না ধর্ম এক থাকলেও। বরং মুসলমান নবাব -বাদশারা স্বজাতীয়দের উচচাকাঙ্ক্ষাকে ভয় পেতেন বলে অনেকেই স্থানীয় কর্মচারী রাখা পছন্দ করতেন। তা হলেও ধর্ম এবং কোনো - কোনো ক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কৃতি এক বলে শ াসনক্ষমতা মুসলমান রাজাদের হাত থেকে চলে যাওয়ার পর একদিকে যেমনউচচবর্গের মুসলমানরা অসহায় বোধ করতে শু করেন, তেমনি ইংরেজরাও মুসলমান মাত্রকেই মুসলমান রাজাদেরপ্রতিভূ মনে করে গোড়ার দিকে তাঁদের উপর প্রচুর দমন - পীড়ন চালিয়েছিল। এই অবস্থায় মুসলমানরা ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এটা আশা করা যায় না, তা ছ াড়া ধর্মের সূত্রেই নিজেদের রাজার জাত মনে করা এবং নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আত্মাভিমানী রইস খানদানি মুসলম ানরা ইংরেজি শিক্ষা - দীক্ষা থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলেন। সেই সংকটে একদিকে যেমন ইসলামের মূল শিক্ষায় ফিরে যাবার দাবি উঠল, তেমনি আবার স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো কেউ - কেউ বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে মানিয়েচলার কথাবলতে লাগলেন। ওহাবি - ফরায়েজি আন্দোলন নিছক ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, বিদেশি শাসনের বিদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবেও তাদের ঐতিহাসিক গুত্ব আছে। ফরায়েজি নেতা দুদু মিঞা র দলে তো কিছু হিন্দু কৃষক, কারিগর ও নিম্ন বর্ণের মানুষও ছিলেন। ওহাবি আন্দোলন থেকেই তিতুমির ইংরেজ ও জমিদার - বিরোধী জননেতা হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে ধর্মের উপকরণও ছিল যথেষ্ট, যার ফলে মুসলম ানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি পায়। কে আগে উসকেছিল, এ বিতর্ক ডিম আগে না মুরগি আগের মতোই সমাধ ানহীন। একদলের অনুদার আচরণ আর - এক দলের অনুরূপ আচরণে প্ররোচনা জুগিয়েছে। এইভাবেই হিন্দু - মুসলম ানের বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে।

মীর মশার্‌রফ হোসেনের সমকালে আর যে সব মুসলমান লেখক ছিলেন বাংলায়, তাঁদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের মিশ্রণ ঘটেছে। ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলা ও ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে গো - রক্ষণী সভা গঠিত হয়। হিন্দুমেলা ও তার অনুরূপ সংগঠনগুলিতে মুসলম ান, খ্রিস্টান প্রভৃতি অহিন্দুর স্থান ছিল না। হিন্দুদের গোরক্ষা আন্দলোনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৯ সালে 'গোকুল নির্মূল অ াশঙ্কা' লেখার জন্য একদল মুসলমান মশার্‌রফকে কাফের ঘোঘণা করেছিলেন। যে সবমুসলমান লেখক সাম্প্রদায়িক মনে াভাব পোষণ করতেন না, তাঁরাও মনে মনে দুঃখী ছিলেন হিন্দু লেখকদের সাম্প্রদায়িক ব্যঙ্গ - বিদ্রূপের জন্য। কাজী ইমদ াদুল হক মুসলিম রক্ষণশীলতার বিরোধী হয়েও হিন্দুদের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁহারা মুসলমান জাতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতো আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানুষও নিজেদের আল াদা সংস্থা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গড়েছিলেন কেননা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গিয়ে তাঁরা বড়লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতো উপেক্ষিত বোধ করতেন। বঙ্গভঙ্গ ও তার ঠিক পরের বছরে ঢাকায় মুসলিম লিগ স্থাপনা, আরও কয়েক

বছরের মধ্যে পালটা হিন্দু কনফারেন্স হিন্দু সভা - হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি নামে হিন্দুদেরও প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক দলগঠন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে ক্রমাগত কলুষিত করে তোলে। রেজাউল করীম তাঁর বইয়ে আনন্দমঠের বহি - উৎসব অধ্যায়ে লিখেছেন, সেদিন বাংলার রাজধানী কলিকাতার বুকে লীগ - পন্থী মুসলমানদের একটি মহতী সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত পুস্তক আনন্দমঠের মহাসমারোহে বহি - উৎসব হইয়া গেল। সভ্য - জগৎ স্তম্ভিতচিত্তে দেখিল, ভারতের একটি সুবৃহৎ শহরে, বহু শিক্ষিত ও সাহিত্য - সেবকের সম্মুখে ও সম্মতিক্রমে এমন একটি অনাচার হইয়া গেল, যাহা ববর্বরতায় মধ্য - যুগের ধর্মান্ধ জাতিবৈরীদের সমস্ত অত্যাচারকে পরিম্লান করিয়া দিল। শুধু রাজনৈতিক নেতা নয়, সাহিত্যিকদের একাংশেরও যোগসাজশে ঘটেছিল এই লজ্জাজনক ঘটনা। কিন্তু একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। এ দেশে ইংরেজ আগমনের পর থেকেই হিন্দু - মুসলমান সম্পর্কে একটু - একটু করে যে বিষ জমছিল, তার সঙ্গে এর যোগ অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিশ শতকের গোড়াতে বীরভূমের এক গ্রামে রেজাউল করীমের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ছোটোখাটো জমিদার। তিনি ইংরেজি পড়েননি, কিন্তু আরবি - ফারসি ভালোরকম জানতেন। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামি শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। নিজের তিন ছেলেকেই তিনি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আধুনিক শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা ওই আমলের সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বিস্ময়কর মনে হয়। বড়ো ছেলে মঈনুদ্দীন হোসায়ন রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। মঈনুদ্দীনকে এখনকার মানুষ ভুলে গেছে কিন্তু দেশভাগেরআগে সাহিত্যিকমহলে তাঁর মোটামুটি ভালোই পরিচিতি ছিল প্রকাশক হিসেবে। তিনি নূর লাইব্রেরী নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা চালাতেন। কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম বই মীর - পরিবার বেরিয়েছিল সেখান থেকেই ১৯১৮ সালে। দেশভাগের সদ্য পরে ওদুদের আরে দুটি বই ছেপেছিলেন তিনি। ভাই রেজাউল করীমের বেশ কয়েকটি বইয়েরও তিনি প্রকাশক। মজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজল ইসলামের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য ছিল। নজল - প্রমীলার বিয়েতেতিনি গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রমীলাকে ধর্মান্তর না করিয়েই বিয়ে করেছিলেন নজল এবং তাওইসলামি মতে। এই অসম বিবাহের পুরোহিত ছিলেন মঈনুদ্দীন। ইহুদি বা খ্রিস্টানের সঙ্গে মুসলমানের বিয়েতে বাধা নেই কেননা তাঁরাও মুসলমানের মতো ঈশ্বর - প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাসী। হিন্দুরাও বেদকে অপৌষেয় মনে করেন, তবু হিন্দুকে আহলুল কিতাব (কিতাবওলা) বলার কোনো পরম্পরা নেই। কিন্তু মঈনুদ্দীন ধার্মিক মুসলমান (রেজাউলকরীম এবং তাঁর এই দাদা দুজনেই জীবনে কোনোদিন দাড়ি কামাননি) হয়েও সেই উদারতা দেখিয়েছিলেন, যা নিয়ে বিশেষ প্রচার হয়নি। আসলে একজন মানুষকে জানতে গেলে তাঁর পরিবারের কথাও কিছুটা জানা দরকার। রেজাউল তাঁর দাদা মঈনুদ্দিনের ছায়াতেই বড়ো হয়েছিলেন। মঈনুদ্দীন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। দাদার কাছে থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন ক্যালকাটা মাদ্রাসা থেকে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এই সময় মুর্শিদাবাদে সালার গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাকতার জন্য তাঁকে নিয়ে যান বরকত গনি খান চৌধুরির মামা কংগ্রেসি নেতা মকসুদুল হোসেন। পরে আবার পড়াশোনা শু করে ম্যাট্রিকদেবার নয় বছর পরে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। যথাসময়ে বি এ-ও পাস করেন একই কলেজ থেকেই। এরপর অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে হয়। মাঝে - মাঝে বাধা পড়লেও পড়াশোনার আগ্রহ বজায় ছিল। চৌত্রিশ বছর বয়সে (জন্মসাল ১৯০০ ধরলে) এম এ পাস করেন এবং আরো বছরখানেক পরে আইন। রেজাউলের মেজদাও গ্র্যাজুয়েট এবং আরবি - ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের পরিবারের আর - এক উজ্জ্বল সন্তান তাঁরই সমবয়সী ভাগনে বিজ্ঞানী ড. কুদরত - ই - খুদা। পারিবারিক সূত্রে রেজাউল পেয়েছিলেন শিক্ষার ঐতিহ্য, আরবি - ফারসি জ্ঞান, উদাররনৈতিক ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং কংগ্রেসি আদর্শ। তাঁর মামা আইনজীবী আবদুস সামাদও ছিলেন আজীবন কংগ্রেস কর্মী। ১৯৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। তখনবাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে লিগ সরকার। ঢাকা থেকে যে বঙ্কিম - শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে শতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র দাসের অনুরোধে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মুসলমানের ঋণ নামে। সম্ভবত সেই শু তাঁর মুসলিম সমাজে বঙ্কিম সম্পর্কে একপেশে নিন্দাবাদের বিরোধিতা।

রেজাউল করীমের বঙ্কিম - বিষয়ক গ্রন্থের পরিশিষ্টে সমসাময়িক আরো দুজন লেখকের লেখা স্থান পেয়েছে। সমমনা এই দুজন হলেন কাজী আবদুল ওদুদ এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। উদারচেতা ও অসাম্প্রদায়িক লেখক হিসেবে দুজনেরই খ্যাতি

আছে। ওদুদ তাঁর বড়দার বন্ধু এবং সেই হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তো এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। রেজাউলের বঙ্কিম - প্রীতির সঙ্গে ওদুদের রামমোহন - প্রীতির তুলনা করা যায়। কিন্তু বঙ্কিম সম্পর্কে ওদুদের মিশ্র ধারণা ছিল। অসহিষ্ণুতা ও সত্যদৃষ্টি এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবের অধিকারী বলে মনে করতেন তিনি বঙ্কিমকে। তবে মুসলমানের প্রতি বঙ্কিম বিদ্বিষ্ট এ অভিযোগ ওদুদও মানতে চাননি। তিনি সাফ লিখেছেন, হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম - সাহিত্যে যতই থাকুক তার সত্যকার প্রতিপাদ্য হিন্দুত্ব নয় মানবতা। এবার দেখা যাক শহীদুল্লাহ্ কী বলেছেন বঙ্কিম সম্পর্কে। তিনিও তাঁর লেখায় বঙ্কিমের সাম্যচিন্তার প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমকে উদ্ধৃতকরে (সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু।) তিনি বলেছেন, যে দিন হিন্দু বঙ্কিমের এই বৈষ্ণবের মত গ্রহণ করিবে, সে দিন হিন্দু - মুসলমান সমস্যা থাকিবে না। সাম্প্রতিককালের বঙ্কিম - নিবেদিত গবেষক হিসেবে সুনাম আছে বাংলাদেশের সারোয়ার জাহানের। এই বিষয়ে তাঁর দুটি বইপ্রকাশিত হয়েছে ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে --- বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূল্যায়নের পালাবদল এবং বঙ্কিম - উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র।

দেশভাগের আগে বঙ্কিমের লেখা বাংলার মুসলিম লেখকদের এতটাই উত্তেজিত করেছিল যে সুধু এর জবাব দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা গোছা গোছা উপন্যাস লিখেছিলেন। একজন তো বঙ্কিমচন্দ্রের সব কটি উপন্যাসেরই প্যারডি তৈরি করেছিলেন। হিন্দু নায়কের প্রতি মুসলিম রাজপরিবারের মেয়ের প্রেম এই লেখকেরা যেন নিজেদেরই অসম্মান বলে ধরে নিয়েছিলেন, আর মনের ঝাল মেটাতে কাহিনির মুসলমানিকরণ করেছেন হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান যুবকের প্রেম দেখিয়ে। যে - কোনো সামাজিক বিদ্বেষে নারীই হয় আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য, নারীর সম্মান হানিকরা যেন তার পরিবার, সমাজ ও দেশের বিদ্ধেই চরম প্রতিশোধ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সব দেশেরই নোংরাগালাগালি পুষের বিদ্ধে হলেও লক্ষ্য তার নারী। দুর্ভাগ্যবশত বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল। একদল দুষ্কৃতকারী বঙ্কিমের বইয়ের উপর লিখে দিয়েছিল, শ্যালক বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী। গরম মাথার অল্প মেধার মানুষরাই এইসব কাজ করতেন, অনেকসময়, রাজনৈতিক প্ররোচনাবশত, কিন্তু যাঁরা সমাজের সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁরা মনের ভিতরেক্ষোভ থাকলেও এইধরনের আচরণ সমর্থন করেননি। এস ওয়াজেদ আলী সতর্ক করে দিয়েছিলেন, গালাগালি দিয়ে কেউ কখনও প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। একজন লেখকের মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কথা বলে তাঁর সমাজ ও পারিপার্শ্বিক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যত বড়ো লেখকই হোন, তাঁর লেখাও অনপেক্ষ নয়। পাঠবস্তু বিনির্মাণের যেপদ্ধতি দেরিদা দেখিয়েছেন, তার প্রয়োগ করতে পারলে বঙ্কিম - উপন্যাস থেকেও কৌতূহলোদ্দীপক ফল পাওয়া যেতেপারে

রেজাউল করীমের বইয়ে মোট নটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলির শিরোনাম --- বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, অহিন্দুর দৃষ্টিতে বঙ্কিম - প্রতিভা, বঙ্কিম - সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের ঋণ, কৃষক - বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠের অমৃতময় ফল, আনন্দমঠের বহি - উৎসব, বন্দেমাতরমে আপত্তি কেন? এবং ইসলাম ও বন্দেমাতরম। নাম প্রবন্ধে রেজাউল করীম প্রশ্ন করেছেন, এতদিন তাঁহার বিদ্ধে কোন অভিযোগ উঠে নাই,আজ উঠিবার কারন কি ? রেজাউলের অনুমান ঠিকই, তিনের দশকে উত্তাল বঙ্কিম - বিরোধিতা ছিল অনেকখানিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু আগে একেবারে কোনো অভিযোগ ওঠেনি এমনও বলা যাবে না। প্রতিশোধমূলক লেখার শৃঙ্খলায় গোড়ার দিকেই আছে আর্জুমন্দ আলীর উপন্যাস প্রেম দর্পন (১৮৯১)। বঙ্কিমের প্রতি তীব্র সাম্প্রদায়িক কটাক্ষ ছিল নবণূর পত্রিকায় প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রবন্ধে। রেজাউলের আর প্রশ্ন 'আনন্দমঠ হিন্দুকে মুসলিম - বিদ্বেষী করিতে সাহায্য করিয়াছে, না জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছে?' প্রথম প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। এরপরও যদি কেউ মনে করেন বঙ্কিমের লেখায় মুসলিম বিদ্বেষ আছে, তাঁদের জন্য করীমের পরামর্শ, 'তুমি কাহাকে আক্রমণ করিয়াছ, কাহার বিদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছ, তাহা দেখিবার বিষয় নহে।' সন্দেহবাদীদের প্রতি তাঁর জিজ্ঞেসা, 'কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন?' রেজাউলের অনুমান, বঙ্কিম ইংরেজদের লেখা ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়েছেন। তা ছাড়া উপন্যাসের চরিত্রের কথা লেখকের নিজের কথা নাও হতে পারে। প্রবন্ধে সে - আড়াল নেই। বঙ্কিম যদি সত্যিই মুসলিম - বিদ্বেষী হতেন তা হলে প্রবন্ধ লেখার সময় ধরা পড়ে যেতেন। 'বঙ্কিম সাহিত্যে মূসলমান চরিত্র' প্রবন্ধে

রেজাউল এই কথার উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধে বাংলার পাঠান শাসকদের প্রশংসা রয়েছে, আওরঙ্গজেব এবং আকবরকে তিনি আলাদা করে দেখেছেন এবং 'সিরাজের পরাজয়কে বাঙ্গালীর পরাজয় বলিয়া ভাবিতেন।' এককালে মুসলিম লেখকরা বঙ্কিমের যে-অপযশ করেছেন, এখনকার ধর্মনিরপেক্ষ লেখকরাও কেউ কেউ একই কাজ করতে গিয়ে বঙ্কিমের 'ভারত - কলঙ্ক' প্রবন্ধটির সাহায্য নেন যাতে বঙ্কিম বলেছেন, 'হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব।' কিন্তু একই সঙ্গে তিনি যে একটু পরেই এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন, 'এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুতর দোষাবহ বিকার আছে।' বলে, তা তাঁরা নিজেদের সুবিধার্থে চেপে যান।

রেজাউল মানেন বঙ্কিমের দোষ - ত্রুটি আছে। ' কিন্তু তাঁহার বিদ্ধে অভিযোগ যাহাই উঠুক, তিনি এত বড় যে, সেগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিবার মত শক্তি তাঁহার আছে।' রেজাউলের ধারণা, 'বঙ্কিমের যে অংশটা মুসলিম - বিদ্বেষমূলক বলিয়া প্রচার করা হয়, মনে হয় সেটা স্বেচ্ছাকৃত নহে, সেটা যুগের প্রভাব ও যুগের ছবি মাত্র।' তবে কিধরে নিতে হবে যুগস্রষ্টা নন, নিজেই যুগের সৃষ্টি? রেজাউল আরও বলেছেন, 'এ দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সহিত ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করিলে কেন? তাঁর মতে, 'এর জন্য দায়ী পরবর্তী যুগের শাসকবর্গের কূট রাজনীতি।' একসময়ে বাংলার জমিদার বলতেই ছিল হিন্দু আর কৃষক বলতে মুসলমান। রেজাউল বঙ্কিমচন্দ্রকে 'কৃষক - বন্ধু' আখ্যা দিয়েছেন। যে - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলমান উচচবর্গের দুর্দশা ও হিন্দু জমিদারদের সৌভাগ্যের মূল কারণ, কৃষকের স্বার্থে তার নিন্দা করতেও পিছপা হননি বঙ্কিম। তিনি বাংলার কৃষককে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার নজরে হাশিম সেখ ও পরাণ মণ্ডলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।' সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম - বিদ্বেষী যদি হতেন, 'কোটি কোটি মুসলমান যে কৃষকের একটা প্রধান অঙ্গ, তাহার কল্যাণের জন্য 'উচচ শ্রেণীর হিন্দুদের প্রধান অবলম্বন জমিদারীপ্রথার ত্রুটি দেখাইতে এত ব্যস্ত হইতেন না' তিনি।

রেজাউল লিখেছেন, 'বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে আছে আনন্দমঠের পূর্ণ প্রভাব।... সেই আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কেবলমাত্র একখানি গ্রন্থ আদৃত হইত -- ধর্ম্মগ্রন্থের মত সর্ব্বত্র পঠিত -- সে গ্রন্থ আনন্দমঠ।' বাঙালি মানেই শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক, রেজাউলও এখানে সেই ভুল করেননি তো? তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'আনন্দমঠে কি আছে? উত্তরে বলেছেন, 'ইহা জাগ্রত স্বদেশ - প্রীতিরই একটি বাস্তব রূপ, মুসলমান নবাবদের অত্যাচার আবরণ মাত্র'। রেজাউলের আনন্দমঠ পাঠের সঙ্গে আমরাও যখন মিলিয়ে নিতে পারি নিজেদের পাঠ। পাঠের ধরন বদলায় পরিস্থিতি অনুযায়ী, প্রত্যেকবার পাঠের অভিজ্ঞতা একধরনের হয় না। যখন সাহিত্যের রস নেবার জন্য আমরা পড়ি তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হয় উদার পাঠ, আর যখন পাঠ - প্রতিক্রিয়া জানানোর দায়িত্ব থাকে তখন বাধ্য হই বিচারমূলক পাঠে প্রবেশ করতে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই লেখক প্রবাসে থাকাকালে আনন্দমঠপড়তে গিয়ে কী বেকায়দায় পড়েছিলেন তা না বলে থাকা গেল না। একা - একা পরিবার থেকে দূরে দক্ষিণ ভারতের এক শহরে, হোটেলে বসে কোনো এক রবিবারে তিনি আনন্দমঠ পড়তে শু করেছিলেন। এক বৈঠকে পড়া শেষকরে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি, হু হু করে কঁাদতে আরম্ভ করেছিলেন। কীভাবে যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তিনি উপন্যাসের ঘটনা এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে, হতে পারে রেজাউল যে - স্বদেশ - প্রীতির কথা বলেছেন, তা-ই প্রভাবিত করেছিল তাঁকে । কিন্তু বিচারমূলক পাঠে রসভঙ্গ অনিবার্য হয়তো কিছু বেদনাও জোটে সেইসঙ্গে।

আনন্দমঠের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিল, 'সমাজ - বিপ্লবে অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।' দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন নিজে না লিখে 'দ্য লিবারেল' পত্রিকা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন লেখক। যার মর্মার্থ, মুসলিম শাসনের অত্যাচার - অনাচার থেকে মুক্তি দিতে ইংরেজকে বাংলায় পাঠিয়েছেন ভগবান। তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে লেখক- জানিয়েছেন, পরিশিষ্টে বাংলার সন্ন্যাসীবিদ্রোহের 'যথার্থ' ইতিহাস 'ইংরেজি' গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হল। যথার্থ পাঠ যে ইংরেজিতেই পাওয়া যায়, এ বিশ্বাস এখনও আমরা বহন করি। উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কের কথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন উপন্যাসে এবং উপন্যাস

- সম্পর্কিত ঘোষণায়। ইতিহাসের ঘটনার প্রতি যে তিনি ঋিস্ত, পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের যেটুকু অনৈক্য ছিল, তাও দূর করা হয়েছে একথা জানিয়েও উপন্যাসের সূত্রপাত ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ঘটন া দিয়ে, বাংলার ইতিহাসখ্যাত মন্বন্তরগুলির প্রথমটি যে - বছরেঘটেছিল। ২৩ জুন ১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধ জয়ী হয়ে ইংরেজ বাংলার রাজনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও পরবর্তী নবাবদের নিয়ে খুব একটা স্ব স্তিতে ছিল না ইংরেজ, এমনকি পলাশির চক্রান্তের শরিক মিরজাফরও ইংরেজদের হাত থেকে বেরোতে চাইছিলেন। মিরক াসিম তো ইংরেজদের তাড়াতেই চেয়েছিলেন, আর ইংরেজও নবাবকে তাঁবেদার করে রেখেও সরাসরি নবাবি হঠাতে স াহস পায়নি। এরই মধ্যে তারা সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি আদায় করে নিয়েছিল। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানির সূত্রে রাজস্ব আদায়ের অধিকারের সঙ্গে - সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতাও তারা হস্তগত করে নেয় পুতুল - নবাব নাজম - উদ্‌দৌলার কাছ থেকে। দায়িত্ব নবাবের অথচ ক্ষমতা ইংরেজের, এই বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল মন্বন্তরের চার বছর আগে থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'মলম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, ... একেব ারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ববাড়াইয়া দিল।' কার জন্য খাজনা উসুল করতেন রেজা খান? আসল কর্তৃত্ব তো ছিল ইংরেজের হাতেই। গভর্নর হেস্টিংস কোম্পানির কর্তাদের কাছে বুক ফুলিয়ে দাবি করেছিলেন, জনসংখ্যার অন্তত এক তৃতীয়াংশ মারা গেলেও ওতার ফলে কৃষির উৎপাদন কমে যাওয়া সত্ত্বেও যে-বছরে ভালো ফসল হয়েছিল তার চাইতেও দুর্ভিক্ষের পরে রাজস্ব আদায় হয়েছে বেশি। কার্ল মার্কস ইংরেজকেই দায়ী করেছিলেন দুভিক্ষের জন্য এবং আধুনিক ঐতিহাসিকরাওমনে করেন প্রাদের কষ্ট দূর করবার কোনো চেষ্টা না করে কোম্পানি শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখেছে এই অবস্থ াতেও। রমেচন্দ্র মজুমদার স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী আমল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই শেষ হইল।' নবাব যত অপদার্থই হোন শাসনের কার্যকরী ক্ষমতা হারিয়ে প্রজাদের উপকার কিংবা ক্ষতি কিছুই করার অবস্থায় ছিলেন নাতিনি। তথাকথিত ইংরেজ সুশাসনের প্রথম অবদানই বলা যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ঔপনিবেশিকদের স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সাহ ায্যের দরকার ছিল নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার বৈধতা অর্জনের জন্য। দু পক্ষের যোগসাজশে ইংরেজ সুশাসনের কথা এমন সুকৌশলে প্রচার করা হয়েছিল যে স্বাধীনতার ছ দশক পরেও এখনও অনেকে ভাবেন, ব্রিটিশথাকলেই ভালো হত। অর্থনীতিবিদরা পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন ইংরেজের রাজত্বে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি ৪ জনে ১ জন, গড় অ ায়ু বিশ শতকের প্রথম পাদেও ২৫ -এর উপরে ওঠেনি, দেশভাগের সময সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১১ শতাংশ এবং দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনে, জাতীয় আয় ১ শতাংশও বাড়েনি।

সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ ছিল কার বিদ্ধে? সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিয়াছেন, 'আমরা রাজ্য চাহি না -- কেবল মুসলমানেরা ভগব ানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।' বঙ্কিমচন্দ্র যদিও বলে দিয়েছেন, 'উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে', কিন্তু ইতিহাসের প্রতি তাঁর এতই ভক্তি যে তৃতীয় সংস্করণে বইয়ের পরিশিষ্টে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে ইংরেজের সরকারি বয়ান সুদ্ধ জুড়ে দিয়েছেন। আমরা যে-ইতিহাস পড়ি সে তো ইংরেজের ডাক্তারি করা ইতিহাস -- ইংরেজরা নিজেরাই লিখেছে, নয়তো ইংরেজের পাঠশালায় পড়া দেশীয় ঐতিহাসিকরা। যেখানে সন্ন্যাসী - বিদ্রোহের উল্লেখ খুঁজতে হয় আতস কাচ দিয়ে। কিন্তু আনন্দমঠের কল্যাণে সন্ন্যাসী - বিদ্রোহের নামজানা হয়ে গেছে সব বাঙালিরই, যদিও সে-জ ানা অর্ধেক জানা। ইতিহাসে সন্ন্যাসীর সঙ্গে ফকির শব্দটি যুক্ত, মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিররাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এই বিদ্রোহে। ইংরেজরা তখন সবে এসেছে এদেশে, তারা ফকির - সন্ন্যসীর পার্থক্য বুঝতো না। ফকিরদেরও সন্ন্যাসীই বলত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' গ্রন্থে সম্ভবত কোনো ইংরেজের অ াঁকা একটি ছবি আছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহী পরিচয়ে।দেশীয় সেপাইরা ঘিরে রেখেছে ঘোড়ায় বসা এক বিদ্রোহীকে। দাড়ি - গোঁ াফ, অস্ত্র ও পোশাক - আশাকে পুরোদস্তুরমুসলিম ফকিরের চেহারা। রাজস্বের অধিকার হাতে পাবার পর ইংরেজ ভাবল ফকির - সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাবৃত্তিও বুঝি কোনো পালটা করব্যবস্থা, তাই তারা সেটা বন্ধ করতে চেয়েছিল। তাতেই খেপে গিয়ে ইংরেজের বিদ্ধে বিদ্রোহশু করেন ফকির - সন্ন্যাসীরা, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন চাষি, তাঁতি ও নবাবের কর্মচ্যুত সেপাইরা যাঁরা ইংরেজ ক্ষমতায় বসায় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ চলেছিল পলাশির পরের দশক থেকে ওই শতকের শেষ পর্যন্ত। বিদ্রোহী ফকির এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াও ছিল। তাঁদের বিদ্রে াহ ছিল পুরোপুরি ইংরেজের বিদ্ধে এবং তা যে চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে, আনন্দমঠ পড়ে তা বুঝবার উপায় নেই। ব্রিটিশ-

বিরোধী সংগ্রামে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের কথাই বেশী গুত্ব পায়, তার আগেও যে একশো বছর ধরেইংরেজের বিদ্ধে লড়েছিলেন দেশীয় রাজারা, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগণ সে-ইতিহাস গৌণ মনে করাহয়। অপদার্থ, ধর্মান্ধঅসভ্য ইত্যাদি অপব্যাখ্যা দিয়েছিল ইংরেজ এদের সম্পর্কে এবং সেই কলঙ্ক মোছার চেষ্টা হয়নি ইংরেজ চলে যাবার পরও।

রেজাউল আনন্দমঠের সমর্থনে লিখেছেন, 'মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল কথিত বাক্যগুলি বাহিরের আবরণমাত্র -- অ াইনের বেড়াজাল হইতে পুস্তকটিকে বাঁচাইবার কৌশল মাত্র' মুসলমান তখন ক্ষমতারহিত। ফলে মুসলমানকে আবরণ করে অনায়াসে বলা গেছে, 'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা।' তাহলে আবরণের তলায় আনন্দমঠের গোপন কথা কি? রেজাউল এর উত্তর দেননি। বারে বারেই শুধু বলেছেন, 'আনন্দমঠের জাগরণী বাণী,স্বদেশ - প্রেমের মহান অ াদর্শের কথা অর্থাৎ ইংরেজকে স্বাগত জানালেও ইংরেজকে মেনে নেবার অভিপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। 'যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে।' এই হল চিকিৎসক তথা মহাপুষের উক্তি, মুসলমানকে জ্ঞানবান করার কোনো প্রস্তাব যার মধ্যে নেই। রেজাউল অবশ্য মুসলমানের স্বার্থের কথাও ভেবেছেন। তাঁর আশঙ্কা, আনন্দমঠ পোড়াবার ফলে 'বহু যুগ পর্যন্ত মুসলমান সমাজ গভীর তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিবে।' পাশাপা শি তিনি কিছু ইয়োরোপীয় লেখকের নাম করেছেন 'যাঁদের পুস্তকপড়িলে মনে হইবে যে, ইসলামের অতবড় শত্রু জগতে অ ার কেহ হইতে পারে না।' বারো শতকের পর থেকে ইসলামি দুনিয়ায় বুদ্ধির চর্চা থেমে গিয়েছিল কারণ প্রশ্ন করবার স্ব াধীনতা তখন আর থাকেনি। আনন্দমঠ উপন্যাসের শেষপর্বে আকস্মিকভাবে চিকিৎসকের আবির্ভাব এবং গল্পের শেষ কথা বলেছেন ওই চিকিৎসকই, যাঁর আর -এক নাম মহাপুষ। চিকিৎসক কেন মহাপুষের ভূমিকায়, এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর নেই উপন্যাসে। উর্দু গজলে কিছু গতানুগতিক চরিত্রে মধ্যে এক গৌণ চরিত্র 'চারাগর'। চারাগর কথাটারও অর্থ চিকিৎসক। মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞানের সূর্য যখন মধ্যগগনে, তখন বহু চিকিৎসক - দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। সেই স্মৃতিই কি এই চিকিৎসক চরিত্রের মূলে? ইউরোপীয় রেনেশাঁসের মশাল প্রজ্বলিত হয়েছিল মুসলিম মুতাজিল া দার্শনিকদের পরিত্যক্ত সাধনার আগুনে তবু ক্রুসেডের পুরোনো জাতিদ্বেষে ইউরোপীয়রা একতরফা কুৎসা করে গেছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিদ্ধে। রাজ্য হারিয়ে এবং বৌদ্ধিক শক্তির পতনের ফলে মুসলমানের তখন খাঁচার বাঘের অবস্থা, খোঁচা খেয়ে বন্য আক্রোশে ফেটে পড়া ছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিল না তার। রেজাউল বোঝাতে চেয়েছেন, অ ানন্দমঠে মুসলমান সম্পর্কে যেসব উক্তি আছে, তা বঙ্কিমের আসল কথা নয়। 'বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধটা কিরূপ ছিল, তাহারই একটা পরিচয় আমরা ইহাতে পাই।' খুব খাঁটি কথা। তবে পরবর্তী সময়ের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সূত্রও কি তার মধ্যে রয়ে যায়নি? রেজাউল বিশ্বাস করেন, 'হিন্দুদের উপর আনন্দমঠের যে প্রভাব পড়িয়াছে, তাহ া হিন্দুদের মনে মুসলিম - বিদ্বেষ জাগায় নাই।' এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় রেজাউলের এই লেখারও আগের লেখা ও প্রগতিশীল বলে বিবেচিত সত্তগাত পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (ফাল্গুন ১৩৩৪), 'আনন্দমঠের পাঠকের মনে জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক একটা মুসলিম - বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।' তা ছাড়া মুসলিম মনে যবন, নেড়ে ইত্যাদি শব্দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। অনুরূপ, মালাউন - কাফের ইত্যাদি সম্বোধনে হিন্দুরাও মনে ব্যথা অনুভব করেছেন। দেশভাগের আগে বন্দেমাতরমের বিদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন 'ইসলাম ধর্মে অভিজ্ঞ ও কোরআন বিশেষজ্ঞ আলেম - ফ াজেল'রা কেউ নন, 'রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী কোট প্যান্ট পরিলিত সাহেবিয়ানা ঢঙের ব্যারিস্টার ও সেই শ্রেণীর লোকে'র াই। রেজাউলের এই লেখা দেশভাগের আগের , আজকাল এই ধরনের ফতোযা যাঁরা জারি করেন, তাঁরা আবার র াজনৈতিক নেতা নন, কিছুদিন আগেও এ দেশে এক মুসলমানকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে বন্দেমাতারম গাওয়ার জন্য। রেজাউলের লেখা থেকে জানা যায়, খিলাফতের যুগে আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি, শৌকত আলি, জাফর আ লি, হসরত মোহানি প্রমুখ মৌলানারা বন্দেমাতরমের বিদ্ধে কোনো আপত্তি তোলেননি, তাঁদের সামনেই বিভিন্ন সভায় এই গান গাওয়া হত এবং তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে গানের প্রতি সম্মান জানাতেন।রেজাউলের বলবার উদ্দেশ্য, ধর্মীয় কারণে নয় মুসলমানকে কংগ্রেসের বিদ্ধে খ্যাপানোর জন্যই এ ছিল লিগের ষড়যন্ত্র। তবে তিনি এখানেই থামেননি, 'যে সঙ্গীতে হিন্দুদের দেবদেবীর নাম উল্লেখ আছে, এবং যে সঙ্গীত আনন্দমঠের অঙ্গীভূত, তাহা কি কোন মুসলমান সমর্থন করিতে প ারে', এ প্রশ্নেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, দেব - দেবী বন্দেমাতরমের আরাধনার বিষয় নয়। আনন্দমঠে

দেব - দেবীকে বরং অস্বীকার করা হয়েছে। দেব - দেবীর প্রসঙ্গ এসেছে দেশমায়ের সঙ্গে প্রতিতুলনা হিসেবে। বন্দেম াতরমের প্রতিটি শব্দ ও পঙ্‌ক্তি বিচার করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে তাতে কোথাও মুসলমানের পক্ষে আপত্তিকর কোনে া কথা নেই। তাঁর মতে, 'খোদার বন্দনা, মহাপুষের বন্দনা, দেশের বন্দনা, শরৎকালের বন্দনা, এ সবই বাংলা ভাষায় চলে', বিভিন্ন অর্থে। সুতরাং বন্দনা বললেই পৌত্তলিকতা হয়ে যায় না। আর দেশকে মা বলাতে দোষ কোথায়? লিগনেত া মৌলানা আকরম খাঁ নিজেও আরবকে মা বলে সম্বোধন করেছেন তাঁর 'মোস্তফাচরিত' গ্রন্থে। বন্দেমাতরমের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে দোষাবহ কিছু পাননি রেজাউল কারণ তাতে 'নদীর জল' গাছের ফল, ভূমিতলের ঘাস, পাখীর গান' এ সবই অ াছে। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি অবশ্যই মুসলমান মনে ধাক্কা দেয়, কিন্তু রেজাউল তার গূঢ় অর্থ অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে,এই পঙ্‌ক্তিগুহিতে আসলে দেশমাকে বড়ো করা হয়েছে হিন্দু দেব - দেবীদের চেয়ে। সব মিলিয়ে আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মুসলমানের মনে যে তিক্ত স্মৃতি গাঁথা আছে দীর্ঘদিন ধরে, রেজাউলের যুক্তি তাতে দাগ কাটতে পারেনি। শুধু মুসলমানেরা নয়, ব্রাহ্মরাও অখুশি ছিলেন বন্দেমাতরমে দেব - দেবীর উল্লেখে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন, 'তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে এক হিন্দু নয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান --- এমনকি ব্রাহ্মও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে প ারে। তুমি কি বলতে চাও, "ত্বংহি দুর্গা", "কমলা কমলদল বিহারিণী", "বাণী বিদ্যাদায়িনী" ইত্যাদি হিন্দু দেবী নামধা রিণীদের স্তব যাদের "প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে" সর্বজাতির গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুদের পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ তাদের আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই।"

বঙ্কিম সন্ন্যাসী - বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, কিন্তু যে - উদ্দেশ্যে তাঁর উপন্যাসের সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেছিলেন তা তাঁরই অ াদর্শজাত। ইংরেজ যে ভারতের উপকার করার জন্য এদেশে এসেছে তা নাকি সন্তানেরা বোঝেননি। ইংরেজের চোখে তাঁর া ছিলেন দস্যু, বঙ্কিমের চোখেও তা-ই। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ - কেউ কামুক প্রকৃতির ছিলেন এ কথাও বলেছেন বঙ্কিম। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম বা বুদ্ধদেবের নাস্তিকধর্মে বঙ্কিমের যে একটুও আস্থা ছিল না, আনন্দমঠ পড়লে তা বোঝা যায়। পৌত্তলিকতাকে তিনি লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন সনাতনধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যে ধর্মে জ্ঞান বড়ো, অ াচার নয়। হিন্দু জ্ঞানবান, গুণবান ও বলবান হয়ে উঠতে পারে ইংরেজ শাসনে, এই বিশ্বাসে থেকে তিনি ইংরেজ শাসনকে স্ব াগত জানিয়েছিলেন। তাঁর সন্তানেরা শুধু যবন সৈনিক মারেনি, তাঁদের নেতৃত্বে হিন্দুরা মুসলমান গ্রামবাসীদের ঘর-বা ড়িতে আগুন লাগিয়ে লুঠপাটও করেছে, মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়ার স্বপ্ন দেখেছে কেউ - কেউ। যুদ্ধে কারা সন্ন্যাসীদের প্রতিপক্ষ? এই যুদ্ধ যে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গেই হয়েছিল, তা অবশ্য বঙ্কিম গোপন করেননি। ইংরেজ ফৌজে প্রচুর দেশীয় সৈনিক ছিল -- 'তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী'। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাছে সকলেই যবন, সকলেই নেড়ে। নবাবের তখন না আছে দেওয়ানি, না আছে নিজামত। কীসের জন্য নবাব সন্ন্যসীদের শত্রু হতে যাবেন? একটাই কারণ যা বঙ্কিম দেখিয়েছেন, তা হল রাজার রাজ্যশাসনে মন নেই। নবাব নাজম - উদ্‌দৌলা প্রশাসনের অধিকাংশ ক্ষমতা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কী করবেন, যখন রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাই রইল না, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থেকে লাভ কী? আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র যে নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর সেই ভাবকল্পনায় মুসলমানের স্থান বড়োই সংকুচিত। কিন্তু রেজাউলের বইয়ের গোড়াতে যে-উদ্ধৃতি আছে তাতে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট জানাচ্ছেন, 'বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ -- এক া হিন্দুর দেশ নহে।... বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু - মুসলমানের ঐক্য জন্মে।' কিন্তু দুর্ভাগ্য, বঙ্কিমকে উপলক্ষ করেই দু পক্ষের অনৈক্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com